জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka
UNIC Dhaka
PEACE IS IN OUR HANDS — 2001-2010 INTERNATIONAL DECADE FOR A CULTURE OF PEACE AND NON-VIOLENCE FOR THE CHILDREN OF THE WORLD
মার্চ ২০০৭ March 2007
১৯শ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা Volume-IXX, No. III

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০৭

নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার দায়মুক্তির অবসান

নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা আমাদের সময়ের সবচেয়ে গুরুতর ও জরুরি চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হিসেবে ক্রমবর্ধমান হারে স্বীকৃতি হচ্ছে। বিশ্বের সব স্থানেই নারী ও মেয়েদের ওপর এই সহিংসতার অত্যন্ত বাস্তব এবং ক্ষতিকর প্রভাব উন্নয়ন, শান্তি ও লিঙ্গাভিত্তিক সমতার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সুশীল সমাজের অভিমত হলো, কোনো পরিস্থিতিই নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা চালানোর অজুহাত হতে পারে না– এই সহিংসতা বরাবরই মানবাধিকারের একটা লঙ্ঘন, বরাবরই একটা অপরাধ এবং বরাবরই এটা অগ্রহণযোগ্য।

নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা যারা ঘটায় তারা প্রায় ক্ষেত্রেই শাস্তি থেকে পার পেয়ে যায়। অনেকের মতে, এই শাস্তি রাহিত্য যেমন ব্যাপক, তেমনি তা অগ্রহণযোগ্য। কারণ এই সহিংসতাই সেই সহিংসতার শেকড় স্থায়ী ও বৈষম্য সৃষ্টি করার একটা মুল উপাদান। নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার জন্য শাস্তি থেকে অব্যাহতিকে সমাজ যতদিন মেনে নেবে ও বরদাশত করবে, ততোদিনই

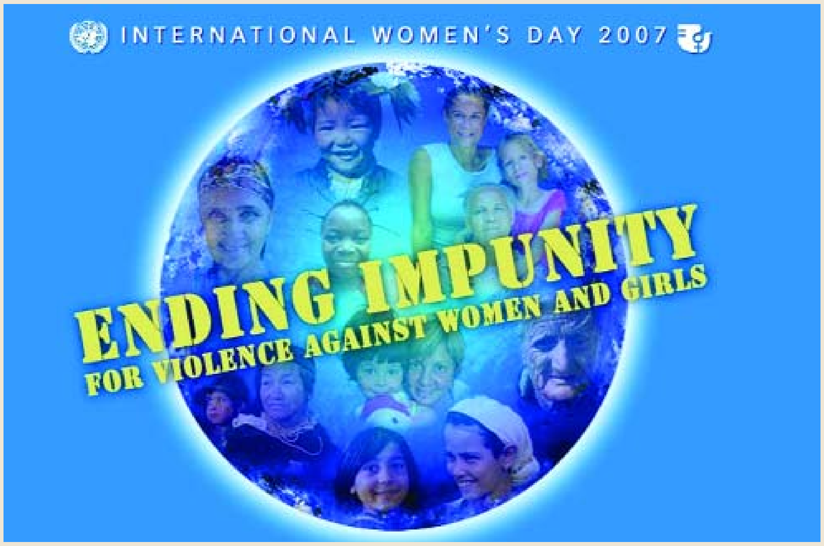

সমাজ সহিংসতার কাজকে মেনে নেবে এবং বরদাশত করে যাবে।

কিন্তু ব্যক্তি ও ব্যাপকভাবে সমাজের ক্ষেত্রে এই সমস্যার গুরুত্ব, মাত্রা, ধরন, পরিণাম ও মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও শাস্তি থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতির অবসান ঘটানো এবং নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা কার্যকরভাবে রোধ ও এর সমাধানের মতো রাজনৈতিক সদিচ্ছার বাস্তবায়ন এখনো হয়নি।

সহিংসতামুক্ত জীবনের অধিকার

নারী ও মেয়েদের যে সহিংসতামুক্ত একটা জীবনের অধিকার রয়েছে তার সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি একেবারেই সাম্প্রতিককালের। ঐতিহাসিকভাবে, যে দায়মুক্তি প্রায় ক্ষেত্রেই সহিংসতার হোতাদের রক্ষা করে তা সহ সহিংসতার বিরুদ্ধে নারীর সংগ্রাম বৈষম্য

থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রামের সঙ্গে নিবি-ড়ভাবে জড়িত। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, শাস্তিদান ও মুলোৎপাটনের মান এবং নিয়মনীতির পরিসর যেমন বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যেও বিশ্ব মানের অনেক অগ্রগতি হয়েছে।

নারীদের প্রচেষ্টাতেই ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন গ্রহণের পথ রচিত হয় যা নারী ও মেয়েদের জন্য প্রধান আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল। কনভেনশনের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, জাতিসংঘ সনদ '... মৌলিক মানবাধিকার, ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা ও মুল্য, নর ও নারীর সমান অধিকারের প্রতি বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করছে।' সনদে এরপর নারীর প্রতি বৈষম্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, লিঙ্গের ভিত্তিতে 'কোনো পার্থক্য, বর্জন বা বিধিনিষেধের পরিণতি হবে... নর-নারীর সমতা, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে ... নারীর এই স্বীকৃতি, ভোগ ও প্রয়োগকে খর্ব বা বাতিল করা।' এই কনভেনশন এবং আরো অনেক আইনি দলিল ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আলোচনার ফলাফল নারী ও মেয়েদের সহিংসতামুক্ত একটি জীবনের অধিকার সমুন্নত রেখেছে।

অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রগুলোর একটা স্বীকৃত কর্তব্য হলো মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা করা, রক্ষা করা, এগিয়ে নেয়া ও পুরণ করা। গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হলো, নারীর অধিকারগুলো মানবাধিকার, যেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নারী ও মেয়েদের লক্ষ্য করে পরিচালিত সহিংসতা থেকে তাদের রক্ষা করা, যে সহিংসতা একটা বৈষম্যমুলক কাজ এবং যা তাদের মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে। তাই নারী ও মেয়েদের সহিংসতামুক্ত একটা জীবনের অধিকার রয়েছে।

একান্ত ও প্রকাশ্য উভয় ক্ষেত্রেই অসমতা ও বৈষম্যের মধ্যে নারী এবং মেয়েদের প্রতি সহিংসতার মুল প্রোথিত রয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ সালের বড় বড় সম্মেলনে নারী ও মেয়েদের জন্য সমতা অর্জন এবং তাদের প্রতি সহিংসতার অবসান ঘটানোর কৌশল ও নীতি নিয়ে আলোচনার জন্য বিশ্বের দেশগুলোকে জাতিসংঘ একত্র করে। ১৯৯৩ সালে নারীর প্রতি সহিংসতার অবসান সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণায় নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতাকে '... নর ও নারীর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে অসম ক্ষমতার সম্পর্কের একটা বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য ও তাদের প্রতি বৈষম্যের পথ সুগম করেছে...।'

একই বছর ভিয়েনা ঘোষণা ও জরুরি কর্মসুচিতে নারীর অধিকারকে মানবাধিকারের মতোই সর্বজনীন বলে ঘোষণা করা হয় এবং লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতার অবসান ঘটানোর আহ্বান জানানো হয়।

এসব প্রক্রিয়ার ফলে গৃহীত হয় বেইজিং প-টফর্ম ফর অ্যাকশন, যা লিঙ্গাভিত্তিক সমতা অর্জনে বিশ্বের একটি নীলনকশা। বেইজিং প-াটফর্মে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এবং তাদের 'মৌলিক স্বাধীনতা' পুরোপুরি ভোগ ব্যাহত করে। প-াটফর্মের একটি মুল কৌশল হলো দায়মুক্তির অবসানে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার এবং সুশীল সমাজকে কর্মোদ্যম করা।

নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা জাতিসংঘে সরকারগুলোর অব্যাহত মনোযোগ পাচ্ছে। ২০০০ সালে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক ১৩২৫ সংখ্যক প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদ সশস্ত্র সংঘাত ও সংঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতিতে যৌন এবং লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা ও ঐসব পরিস্থিতিতে নারী এবং মেয়েদের সুরক্ষার গুরুত্বকে শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্ব আলোচনার মর্মমুলে নিয়ে আসে।

২০০৫ সালে বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে সমবেত বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন, নারীর জন্য অগ্রগতি হলো সবার জন্য অগ্রগতি এবং তারা দায়মুক্তির অবসানসহ নারী ও মেয়েদের প্রতি সব

নিশ্চিত করা পর্যন্ত ব্যাপকতম ব্যবস্থা ও কর্মসহযোগী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিচার নিরাপদ ও অবারিত করা

নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার সমাধান কোন উপায়ে সবচেয়ে ভালোভাবে করা যায় তা নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে দলিল ও চুক্তিগুলোতে যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে আজকের আইনি ও নীতিকাঠামো। যারা সহিংসতার শিকার তাদের জন্য তাদের বিচার চাওয়ার সুযোগ আরো প্রসারিত এবং বিচার চাওয়ার প্রক্রিয়া আরো নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার জন্য দায়মুক্তির অবসান হবে না। সহিংসতার শিকার নারী ও মেয়েরা যখন সহিংসতার কথা জানায় এবং যখন আদালতের প্রক্রিয়া চলতে থাকে, তখন তাদের সুরক্ষা এবং তাদের একান্তভাবে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

পারিবারিক সহিংসতামূলক অপরাধের বিচারের পথ সুগম করার পদক্ষেপও রাষ্ট্রকে নিতে হবে। পরিশেষে যারা যৌন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

পদ্ধতিগত বিধিও সাক্ষ্যপ্রমাণসহ তদন্ত ও প্রতিবেদন দাখিল প্রক্রিয়া অবৈষম্যমূলক হতে হবে এবং আইনি প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে যাদের আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন তাদের জন্য তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। নারী ও মেয়েরাসহ সংশি-ষ্ট সবাইকে সহিংসতা ও বৈষম্যমুক্ত থাকার অধিকার সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে হবে।

হটলাইন, আশ্রয়, নিরাপদ বাসস্থান, সহিংসতার শিকার নারী ও মেয়েদের জন্য চিকিৎসা এবং মানসিক সেবার সুবিধা সংবলিত সহায়তা কেন্দ্রসহ সঙ্কট সহায়তা কেন্দ্রের মতো সমন্বিত, বহু খাতভিত্তিক সহায়তা কার্যক্রম এবং পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। সচেতনতা সৃষ্টির প্রচারণা সহিংসতায় নারী ও মেয়েদের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে সর্বসাধারণের অনুভব শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। বিশেষ করে পুরুষ ও ছেলেদের উপস্থিতিতে সহিংসতা নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনার ফলে সহিংসতায় যে নারী ও মেয়েদের অধিকার লঙ্ঘন হয় তার স্বীকৃতি লালনে তা সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের একটা স্বীকৃতি এমন একটা ব্যাপক অঙ্গীকারের পথ সুগম করবে যা নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য যে জবাবদিহিতা তার অগ্রাধিকারমূলক মনোযোগপ্রাপ্তি এবং দায়মুক্তির অবসান নিশ্চিত করবে।

সব পর্যায়ে কার্যক্রম প্রয়োজন

রাষ্ট্রগুলো, জাতিসংঘ সংস্থা ও এজেন্সিগুলো এবং সুশীল সমাজের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সহিংসতা ও দায়মুক্তি রোধের যে লড়াই চলছে বিশ্বের সব অংশেই বাস্তবক্ষেত্রে তার অর্জিত অগ্রগতি অপ্রতুল ও সঙ্গতিবিহীন। পর্যাপ্ত সম্পদ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা না হলে নারী এবং মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দূর করা যাবে না। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সব পর্যায়ে সহিংসতা নির্মূল একটা অগ্রাধিকার হতে হবে এবং পর্যাপ্ত সম্পদ ও সঙ্কল্পবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যেমে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অঙ্গীকার প্রদর্শন করতে হবে।

নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার অবসান এককভাবে রাষ্ট্রের নয়, বরং সবার। নারী ও মেয়েদের লিঙ্গভিত্তিক সমতা রক্ষা এবং অনেকক্ষেত্রেই একান্ত জীবনে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতাকে সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বা অবিচ্ছেদ্য মনে করার যে আত্মতুষ্টি তার অবসান ঘটাতে সব পর্যায়ে সম্মিলিত ও ব্যক্তিগতভাবে জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ করবে রাষ্ট্র। এমন একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সমর্থন করতে ও ধরে রাখতে হবে, যে পরিবেশে নারী এবং মেয়েদের প্রতি সহিংসতা বরদাশত করা হয় না– যে পরিবেশে বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশী, নারী-পুরুষ সবাইকে এটা নিশ্চিত করার জন্য একযোগে এগিয়ে আসতে হবে, সহিংসতার জন্য দায়ী কেউই শাস্তি থেকে পার পাবে না।

ধরনের বৈষম্য এবং সহিংসতার অবসান ঘটানোর গুরুত্ব স্বীকার করেন।

আন্তর্জাতিক আইনি এবং নীতি কাঠামো এবং সংশি-ষ্ট আঞ্চলিক ও জাতীয় কাঠামোগুলো দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, যার মূলে রয়েছে বৈষম্য। এসব কাঠামো হাতিয়ারসহ এমন জোরালো ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে এর মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষা এবং কেবল সহিংসতাই নয়, যার কারণে সহিংসতা হয় সেই বৈষম্যও দুর করতে পারে। এসব কাঠামো দৃঢ়তার সাথে আরো জানায় যে, নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতারোধ, সহিংসতা যখন ঘটে তখন তার তদন্ত করা, যারা ঘটায় তাদের বিচারের ব্যবস্থা করে শাস্তি দেয়া এবং যারা এর শিকার হয় তাদের প্রতিকার ও পরিত্রাণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

দায়মুক্তি : চক্রভঙ্গোর প্রতি চ্যালেঞ্জ

প্রকাশ্যে বা নীরবে যেভাবেই হোক না কেন নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতাকে মেনে নিলে তা একটা দায়মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যা সেই সহিংসতাকে স্থায়ী করে। কোনো রাষ্ট্র সহিংসতার হোতাকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে ব্যর্থ হলে তা একটা দায়মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যাতে বিচার অস্বীকৃত হয় এবং লিঙ্গাভিত্তিক অসমতার শেকড় আরো গভীরে চলে যায়। অপব্যবহার অব্যাহত থাকলে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়, অসমতা বেড়ে যায়, যা গড়ে তোলে এক অশুভ চক্র।

দায়মুক্তির সংস্কৃতিতে যেসব বিষয় অবদান রাখে তার অন্যতম হলো বৈষম্যমুলক আইন ও নীতি। কোনো কোনো আইন নারী ও মেয়েদের প্রতি সব ধরনের সহিংসতাকে পুরোপুরি অপরাধ হিসেবে পরিগণিত করতে ব্যর্থ হয়। ধর্ষণের কোনো কোনো সংজ্ঞায় নিগৃহীতার অসম্মতির পরিবর্তে বলপ্রয়োগকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। বৈবাহিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ধর্ষণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে এবং কেবল দৈহিক সহিংসতাকে এখতিয়ারভুক্ত করে এমন পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক আইনগুলোও হতে পারে সঙ্কীর্ণ।

যেসব আইনে যৌন সহিংসতাকে কোনো নারীর শারীরিক শুদ্ধতার অধিকার লঙ্ঘনের পরিবর্তে পরিবারের বিরুদ্ধে অপরাধ বা শালীনতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেসব আইনও দায়মুক্তির সংস্কৃতিতে অবদান রাখে। নারীর অধিকার বা তার শারীরিক শুদ্ধতা রক্ষায় কিছুই করার নেই এমন কারণ দেখিয়ে যৌন সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস করা হতে পারে। কোনো ধর্ষক ধর্ষিতাকে বিয়ে করতে সম্মত হলে তার প্রতি নমনীয় আচরণ করা হতে পারে। কোনো পরিবারের প্রতি সহিংসতা এমনকি হত্যার দায় এলেও ইজ্জতের কারণে হত্যা করা হয়েছে বললে সেই পরিবারের সদস্যদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করা হতে পারে। অন্যভাবে উপযুক্ত আইন প্রয়োগে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রও দায়মুক্তিতে অবদান রাখতে পারে।

রাষ্ট্রগুলোকে নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষার বাধ্যবাধকতা পুরোপুরি পালন করতে হলে নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইন গ্রহণ করার বেশি কিছু করতে হবে। এসব আইন প্রয়োগ ছাড়া আরো কিছু তাদের করতে হবে। নতুন নিয়মনীতি প্রচলনের জন্য রাষ্ট্রগুলোকে দায়মুক্তির সংস্কৃতি লালন করে এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কার নিরসনে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে হবে।

বেশ কিছুসংখ্যক রাষ্ট্র নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা রোধ বা তার প্রতি সাড়াদানের প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং তাদের প্রচেষ্টার ফলে শুভ বা প্রতিশ্রুতিশীল চর্চা পরিলক্ষিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কঠোর প্রয়োগ ব্যবস্থা সংবলিত নীতি ও আইনের বাস্তবায়ন এবং শাসনের সব খাতে বিস্তৃতি ঘটে এমন কার্যকর প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর সমাজকে নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করা।

যেসব জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় সবচেয়ে ভালো কাজ হয় বলে দেখা গেছে তাতে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং পুরুষ ও ছেলেদের সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করার মতো আইনি সংস্কার এবং নিরোধ কর্মকৌশল গ্রহণ করা থেকে নিরাপদ, আরো ন্যায়সম্মত আইনের প্রয়োগ ও আদালত গড়ে তোলা এবং যারা সহিংসতার শিকার তাদের জন্য উচ্চতর মানসম্মত সহায়তা সেবা ব্যবস্থা

চিত্রে জাতিসংঘের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে অংশগ্রহণ

জনাব কাজী আলী রেজা তার প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন

দর্শকদের একাংশ

সম্প্রতি ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব কাজী আলী রেজা যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের কয়েকটি দেশের অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ এতে অংশগ্রহণ করেন। জনাব রেজা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারের মুল শিরোনাম ছিল Bridging the link between top-down and bottom-up development.

বিশ্ব পানি দিবস পালন

বিশ্ব পানি দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি আয়োজিত সেমিনারে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা (সর্ববামে)। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী

বিশ্ব পানি দিবস পালন উপলক্ষে অপর একটি সেমিনার যৌথভাবে আয়োজন করে NGO Forum, DPHE, UNICEF, WHO, WSP এবং World Bank. অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান জনাব মো. মনিরুজ্জামান (সর্ববামে বাণী পাঠরত)। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আনোয়ারুল ইকবাল

বিশ্ব পানি দিবস ২০০৭

পানির দুষ্প্রাপ্যতা ও খরার মধ্যে পার্থক্য কি?

অনুর্বরতা ও খরাপীড়িত এলাকার মানুষকে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হলেও অন্য সব এলাকার মানুষও পানির দুষ্প্রাপ্যতায় পড়তে পারে। এমনকি যারা প্রচুর বৃষ্টিপাত বা মিঠাপানির এলাকায় বাস করে, সঙ্কট তাদেরও হতে পারে। আমরা যেভাবে পানি ব্যবহার ও বিতরণ করি, সেভাবে তা যখন ঘর-গৃহস্থালি, কল-কারখানা ও পরিবেশের চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করতে পারে না তখন পানির দুষ্প্রাপ্যতা ঘটে।

কী কী কারণে পানির দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়?

যে কারণেই পানির ঘাটতি দেখা দিক, মিঠা পানির সরবরাহ যে কারণেই দূষিত হোক, লোকের কাছে পানি পৌঁছানোর ব্যবস্থাগুলো যেভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হোক বা উলে-খযোগ্যসংখ্যক লোক যে কারণেই পরিষ্কার পানি থেকে বঞ্চিত থাকুক না কেন, তাতেই দেখা দেয় পানির দুষ্প্রাপ্যতা। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষিকাজে বিপুল পানির ব্যবহার, মানুষের বাড়ির কাছে পানি না থাকা, পানির ওপর উচ্চ হারে মুল্য আরোপ এবং হ্রদ, নদীনালা ও ভুগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত স্থানের বাইরে নির্মিত বাঁধ উপচে পানি চলে যাওয়া।

এই সমস্যা কতোটা গুরুতর হতে পারে?

২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্বের পানি সঙ্কটকবলিত দেশ বা অঞ্চলে বসবাসরত লোকের সংখ্যা হবে ২শ' ৮০ কোটির বেশি। পানি সঙ্কট বলতে যা বুঝানো হয় তা হলো বছরে অধিবাসীপিছু প্রাপ্ত পানির পর্যায় ১ হাজার ৭শ' ঘনমিটারের নিচে থাকা। পানির এই পরিমাণকে কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালি কাজকর্ম, জ্বালানি ও পরিবেশের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জাতীয় ন্যুনতম পর্যায় হিসেবে মনে করা হয়। অবশ্য বিশ্বের বেশির ভাগ অংশেই পানির অভাবের চেয়ে পানি পাওয়ার সুযোগের অভাবই বড় সমস্যা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থায়ন সঙ্কট, দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও শাসন, পানির অন্যায্য বিতরণ ও মুল্য এবং আমাদের পানি ব্যবহার ও বণ্টনের উপায় পরিবর্তনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই হলো মুল বিষয়।

কৃষি কাজে ব্যবহৃত পানির পরিমাণ কি কমানো যায়?

জীবন রক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের প্রচেষ্টায় মানুষের খাদ্য প্রয়োজন। তাই ক্ষুধা সমস্যা হ্রাস ও বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পুরণে আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে কৃষি কাজে সেচের জন্য উত্তোলিত পানির শতকরা ৭০ ভাগ ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো, আমাদের বেশি মানুষের জন্য বেশি খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি আনুপাতিক হারে কম পানি ব্যবহারের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

পানির দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে কি?

মানুষের কর্মকা, বন উজাড় ও দুষণের কতটা প্রভাব জলবায়ুর ওপর পড়ে তা নিয়ে

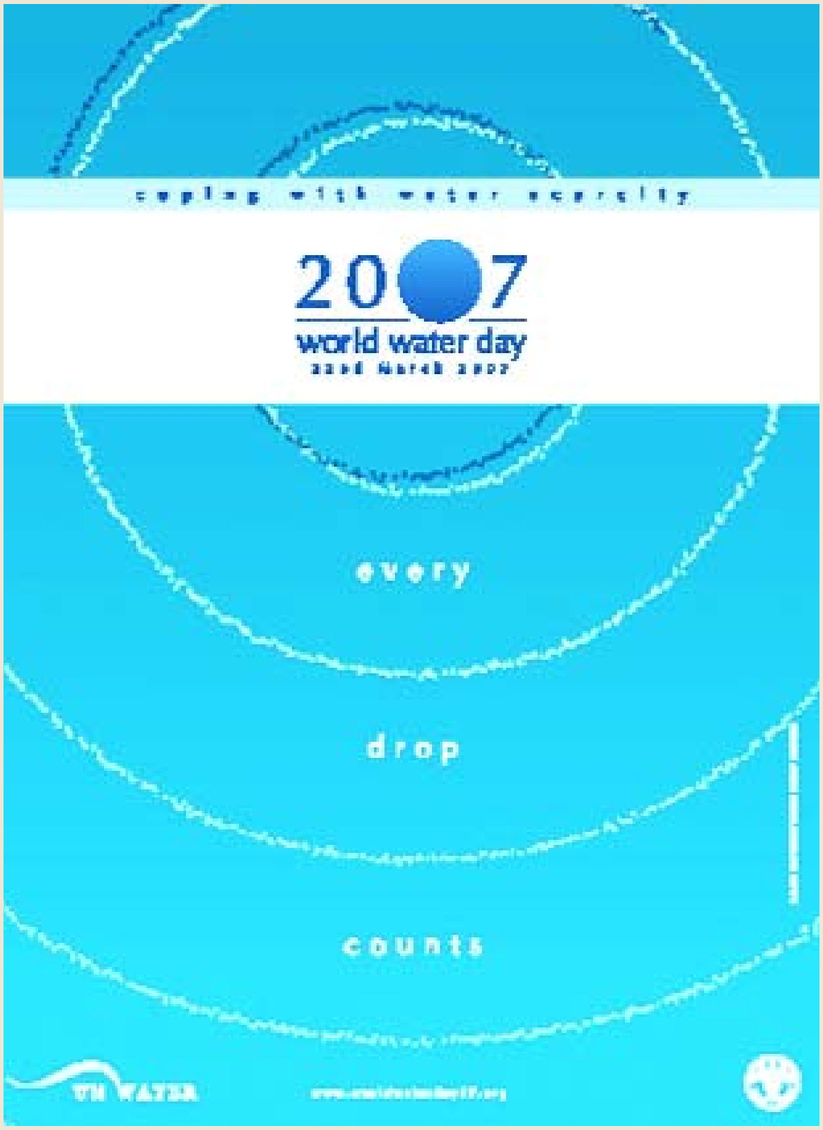

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অনেকেই পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, হিমবাহ দ্রুত গলে যাওয়া, সাম্প্রতিক হ্যারিকেনগুলোর ঘন ঘন সংঘটন ও তীব্রতার কারণ হিসেবে জলবায়ুর পরিবর্তন বা বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বলছেন। এর সবগুলোই একটা সম্প্রদায়ের পানি সরবরাহের পরিমাণ ও নিরাপত্তাকে হুমকিতে ফেলতে পারে।

পানির ঘাটতি কীভাবে দারিদ্র্য সৃষ্টি বা দারিদ্র্য বাড়াতে পারে?

খাদ্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত পানি না থাকলে এবং পান ও উপযুক্ত স্যানিটেশনের জন্য পার্যাপ্ত পানি না থাকলে মানুষ খেতে পারবে না, পর্যাপ্ত উপার্জন করতে পারবে না বা রোগ প্রতিরোধ করতে পারবে না। পুরো শিশু প্রজন্ম, বিশেষ করে মেয়েদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মিঠা পানি সংগ্রহে সময় দেয়ার জন্য শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা ছাড়তে হবে।

পানির উন্নততর সুযোগ লাভের জন্য আরো বেশি মানুষকে কি নগর এলাকায় পাড়ি দিতে হবে?

২০০৬ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় জাতিসংঘ বিশ্ব পানি উন্নয়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে, নগর এলাকায় থাকলেই পানির সুযোগ নিশ্চিত হবে এমন কথা বলা যায় না। নগরীর দরিদ্ররা সচরাচর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কাছাকাছি বসবাস করলেও তাদের জন্য সরাসরি কোনো সরবরাহ নেই বা পানির উচ্চমুল্য পরিশোধের সামর্থ্যও তাদের নেই। এছাড়া বিশ্বজুড়ে নগর এলাকার দ্রুত বিস্তার ও পয়ঃনিষ্কাশন ও শিল্প দুষণের মধ্য দিয়ে পানি সরবরাহে হুমকি সৃষ্টি হয়েছে।

পানির জন্য ধনীর চেয়ে দরিদ্রকে কেন বেশি ব্যয় করতে হয়?

পাইপের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানি যারা পায় তাদের চেয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের বস্তিবাসীদের পানি বিক্রেতার কাছ থেকে প্রতি ইউনিটে পাঁচ থেকে দশ গুণ বেশি মুল্যে পানির কনটেইনার কিনতে হয়। এর কারণ তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহ সুবিধার অভাব; পানি সরবরাহ কার্যক্রমের দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং পানির ন্যায্যমুল্য নির্ধারণের দাবি জানানোর মতো রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাব।

সমুদ্রের পানি লোনামুক্ত করা বা ভূগর্ভ থেকে পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা বেশি নেই কেন?

কোনো কোনো দেশ সমুদ্রের পানিকে মিঠা পানিতে রূপান্তরিত করে; কিন্তু লোনামুক্তকরণ ব্যয়বহুল, এতে প্রচুর জ্বালানি ব্যয় হয় এবং এ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে যে উলে-খযোগ্য পরিমাণ লোনা পদার্থ বের হয় তাতে সামুদ্রিক পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে ও মাছ মরে যেতে পারে। ভূপৃষ্ঠের নিচে প্রাকৃতিক কূপ থেকে উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত ব্যবহারে ফুরিয়ে যেতে পারে এবং তা দুষিত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

ক্ষুদ্র, স্থানীয় পানি প্রকল্প কীভাবে ভিন্নতা আনতে পারে?

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, আমাদের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন থেকে আশু সুবিধা লাভে প্রস্তুত লোকজনকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করলে তা সুফল বয়ে আনে। বিশ্বের বেশির ভাগ মিঠা পানি কৃষি কাজে ব্যয় হয় এবং অধিকাংশ কৃষক ছোট ছোট জমিতে চাষ করে, অনেক সময়েই যার অবস্থান প্রত্যন্ত এলাকায়। স্থানীয় পানি সংরক্ষণ কৌশলের সহায়তায় দিশারি প্রকল্প ও কর্মসুচিগুলো নগর এলাকায় আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হতে পারে, যাতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ দক্ষতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি হ্রাস করতে পারে।

মানুষ কেন অংশগ্রহণ করবে?

প্রতিটি মহাদেশ এবং আমাদের গ্রহের শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ ইতোমধ্যেই পানির দুষ্প্রাপ্যতায় পড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন এবং বেশি উন্নত এলাকাবাসী লোকজনের গৃহস্থালি ও শিল্প-কারখানার কাজে পানির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পরিস্থিতি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। আমাদের জীবনের সবকিছুর সঙ্গেই পানির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, তাই বিপুলসংখ্যক বিশেষজ্ঞ নিয়ে জাতিসংঘের ২৪টি সংস্থা জাতিসংঘ-পানির (টঘ-ডধঃবৎ) মাধ্যমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা মোকাবিলায় একযোগে কাজ করছে। বিশ্বের পানির ব্যবহার উন্নত ও পরিবেশ রক্ষার জন্য তারা সরকার এবং সুশীল সমাজের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করছে।

আমি কী করতে পারি?

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানি সম্পদ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও রক্ষা করা এবং সমাজের সব পর্যায়ের মানুষকে সাধ্যের মধ্যে মুল্যে পানি সরবরাহে নিয়োজিত সরকার, বেসরকারি সংস্থা, বেসরকারি ফাউন্ডেশন ও কোম্পানিকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা। পানি আরো সচেতনভাবে ব্যবহার, দুষণহ্রাস ও পরিবেশ রক্ষায় আপনার যা করণীয় তাই করবেন। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে অর্থায়ন উদ্যোগে সহায়তা করুন। প্রত্যেকেরই পানি প্রয়োজন এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব গ্রহণও প্রয়োজন।

অন্যান্য সংবাদ

জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের

‘গঠনমূলক ফলাফল’

বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলো পরিশেষে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে যে, জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং এখনই কাজে নেমে পড়ার সময় এসেছে। এ কথা বলেছেন জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনের (UNFCCC) নির্বাহী পরিচালক ইয়োভো ডি বোয়ের। জাতিসংঘ সদর দফতরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ২০০৭ সালের ১৫ থেকে ১৭ মার্চ জার্মানির পটসডামে অনুষ্ঠিত ‘গ্রুপ আট যোগ পাঁচ’ভুক্ত দেশগুলোর পরিবেশ মন্ত্রীদের সম্মেলনের অন্তত গঠনমূলক ফলাফলে তিনি অপ্রত্যাশিত উৎসাহ বোধ করেছেন। ‘গ্রুপ অব এইট’ (জি-৮)-এর মধ্যে রয়েছে শিল্পোন্নত কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, রুশ ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। আর ‘যোগ পাঁচ’-এ রয়েছে বিশ্বের অন্যান্য শীর্ষ অর্থনীতি ব্রাজিল, চীন, ভারত, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

মি. ডি বোয়ের বলেন, মন্ত্রীবর্গ যে উপসংহারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন তা হলো মানব কর্মকাণ্ড জলবায়ুর পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে, যে কথাটি বলা হয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেলের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে। তিনি বলেন, সম্মেলনে ‘বিজ্ঞানের বক্তব্য এবং কাজ শুরু করার জরুরি প্রয়োজন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত’ হয়েছে।

মি. ডি বোয়ের বলেন, মন্ত্রীবর্গ স্বীকার করেছেন যে নির্গমন হ্রাস ও দেশগুলোকে ‘জলবায়ু রোধক’ করা প্রয়োজন, যার অর্থ হলো অর্থনীতিগুলোকে জলবায়ুর পরিবর্তনের অনিবার্য কুফল থেকে রক্ষা করা। তিনি আরো বলেন, ‘তারা এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, প্রযুক্তি পুরোপুরি চাবিকাঠি হতে চলেছে এবং কার্বন নির্গমন হ্রাসের অনেক প্রযুক্তি ইতোমধ্যে বিদ্যমান থাকলেও ‘প্রযুক্তিই সমাধানের মূল বিষয় বলে আমাদের আরো বেশি কিছু করতে হবে।’ তিনি বলেন, মন্ত্রীবর্গ আরো স্বীকার করেছেন যে, শিল্পোন্নত দেশগুলোর নির্গমন হ্রাসে পছন্দ করে নেয়ার মতো বেশ কিছু হাতিয়ার রয়েছে। যার মধ্যে উলে-খ্য হলো, অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট খাতগুলোর লক্ষ্য নির্ধারণ, ঘরে ব্যবহার্য সরঞ্জাম বা অটোমোবাইলের দক্ষতা মান নির্ধারণের মতো ব্যবস্থা ও কার্বন নির্গমন হয় এমন কার্যকলাপের ওপর কর আরোপ।

মি. ডি বোয়ের বলেন, ‘জলবায়ুর পরিবর্তন একটা বিশ্বজোড়া সমস্যা, একটা বিশ্বজোড়া সমাধানও এর প্রয়োজন, আর উন্নয়নশীল দেশগুলো এ পরিবর্তনে একটা প্রয়োজনীয় অংশ। পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন পদ্ধতির মতো হাতিয়ারের কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক কার্বন অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করা যেতে পারে, যা উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা থেকে স্থিতিশীল উপায়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনে তারা উপকৃত হবে।’

পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন পদ্ধতির আওতায় কোনো শিল্পোন্নত দেশ উন্নয়নশীল কোনো দেশে কার্বন নির্গমন মাত্রা হ্রাস প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে নির্গমন হ্রাসে তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করে ‘কার্বন ক্রেডিট’ অর্জন করতে পারে। মন্ত্রীবর্গ ঘনঘন ও প্রচণ্ড ঝড় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমবৃদ্ধির মতো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করার জরুরি প্রয়োজনও স্বীকার করেছেন।

মি. ডি বোয়ের বলেন, সম্মেলনের এজেন্ডায় বনাঞ্চল উজাড় করার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। কেননা, মানব কর্মকাণ্ডজনিত নির্গমনের শতকরা ২০ ভাগ আসে গাছপালা উজাড়ের কাজ থেকে।

মি. বোয়ের বলেন, এ বছরের শেষভাগে জার্মানিতে অনুষ্ঠেয় জি-৮ যোগ ৫ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের জন্য এই সম্মেলন একটি চমৎকার উপাদান গড়ে তুলেছে। এছাড়া কার্বন নির্গমন হ্রাসে আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৬৬ সদস্যের কিয়োটো প্রটোকলের জন্য একটি ফলানুবর্তন কাঠামো তৈরিও শুরু হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন। কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ ২০১২ সালে শেষ হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ মন্ত্রী সম্মেলনে উপস্থিত অন্যদের প্রতি ‘২০১২ সালের পর কী ঘটবে তা মোকাবিলায় একটি ম্যান্ডেট নিয়ে সাহসী হয়ে আলোচনা শুরু করার’ আহ্বান জানান।

কারাগার শিশুদের জন্য নয়

আইনের সঙ্গে শিশুদের

বিরোধ : যা করা হচ্ছে তা

বলা হয় কদাচিৎ

আইনের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ অবস্থানের কারণে সারা বিশ্বে ১০ লাখের বেশি শিশু কোনোরূপ ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া বা আইনি প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই আটকাবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। শিশু অধিকার কনভেনশনের মতো সুরক্ষামূলক অগণিত চুক্তি ও কনভেনশন থাকা সত্ত্বেও এটা ঘটছে, যে কনভেনশনে বলা হয়েছে, কোনো শিশুকেই ‘আইন-বহির্ভূত ও অযৌক্তিকভাবে’ তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

অনেক ক্ষেত্রেই এসব শিশুর অবর্ণনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত কাহিনী স্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যায়, কখনো কখনো তা জানাও যায় না। শিশু অধিকারের অগ্রগতি ও সুরক্ষার জন্য কর্মরত স্বাধীন বেসরকারি সংস্থা ডিফেন্স ফর চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালে (ডিসিআই) পরিস্থিতিকে ‘লোমহর্ষক, অগ্রহণযোগ্য, দায়িত্বহীন, অবমাননাকর ও অমানবিক’ বলেও বর্ণনা করেছে।

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ যখন শিশু অধিকার কনভেনশন গ্রহণ করে, তখন থেকে কারান্তরালে শিশুদের পরিস্থিতি বেশি মনোযোগ পেতে থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা এখনো এক নীরব সমস্যা, যা কদাচিৎ মিডিয়ার গুরুত্ব লাভ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), মানবাধিকার ওয়াচ (এইচআরডব-ু), ডিসিআই ও সংশি-ষ্ট অন্যান্য সংস্থা এই সত্য উন্মোচন এবং আইনের সঙ্গে বিরোধে জড়িত বা পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া কারারুদ্ধ শিশুদের অধিকারকে আইন প্রণেতাদের জন্য একটা উচ্চ অগ্রাধিকারে পরিণত করার প্রচেষ্টায় কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক মান বিদ্যমান থাকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তারা দাবি করছে যে, জাতীয় আইনি ও বিচারব্যবস্থায় এমন মান সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org